অধ্যায় ৪

স্মৃতি গঠনের নিউরোবায়োলজি ও বিস্মৃতির ফাঁদ

অনেক শিক্ষার্থীর একটি সাধারণ অভিযোগ হলো, “আমি তো মন দিয়েই পড়ি, কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে কিছুই মনে থাকে না।” শিক্ষার্থীরা একে নিজেদের দুর্বল মেধার লক্ষণ মনে করে হীনমন্যতায় ভোগে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান ও নিউরোবায়োলজি বলে, কোনো তথ্য মস্তিষ্কে ঢোকা (Encoding) এবং সেই তথ্য দীর্ঘদিন জমা থাকা (Consolidation) – এই দুটির মধ্যে বিশাল স্নায়বিক ব্যবধান রয়েছে।

স্মৃতি কোনো ড্রয়ারের ভেতর ফাইল সাজিয়ে রাখার মতো সাধারণ ব্যাপার নয়। এটি মস্তিষ্কের কোটি কোটি স্নায়ুকোষের মধ্যকার বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক সংযোগের একটি পরিবর্তনশীল জাল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্মৃতির কাজকে সহজভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথমত, সেন্সরি মেমোরি বা সংবেদনশীল স্মৃতি। আমাদের চোখ, কান বা ত্বক প্রতি মুহূর্তে চারপাশের পরিবেশ থেকে কোটি কোটি তথ্য গ্রহণ করে। চোখের রেটিনায় একটি দৃশ্যের ছাপ থাকে মাত্র ১ সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়। এই বিপুল তথ্যের মধ্যে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স যেটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, কেবল সেটুকুই পরবর্তী স্তরে পাঠায়।

দ্বিতীয়ত, ওয়ার্কিং মেমোরি বা কার্যকরী স্মৃতি। একে কম্পিউটারের র‍্যামের (RAM) সাথে তুলনা করা যায়। এর স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট এবং ধারণক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, একজন সাধারণ মানুষের ওয়ার্কিং মেমোরি একসাথে মাত্র ৪ থেকে ৭টি নতুন তথ্যের বেশি ধরে রাখতে পারে না। আপনি যখন একটি কঠিন জটিল সংজ্ঞা প্রথমবার পড়েন, তখন সেটি থাকে আপনার এই ভঙ্গুর ওয়ার্কিং মেমোরিতে।

তৃতীয়ত, লং-টার্ম মেমোরি বা দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি। এটি মস্তিষ্কের স্থায়ী হার্ড ড্রাইভ। এই স্তরে একবার তথ্য পৌঁছে গেলে তা মাস, বছর বা আজীবন স্থায়ী হতে পারে।

ওয়ার্কিং মেমোরি থেকে তথ্য কীভাবে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে যায়? এর মূল কারিগর হলো মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের গভীরে থাকা ঘোড়ার নালের মতো বাঁকানো একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ – হিপোক্যাম্পাস (Hippocampus)। যখনই নতুন কোনো তথ্য পড়া হয়, হিপোক্যাম্পাস সেটিকে সাময়িকভাবে ধরে রাখে। কিন্তু তথ্যটিকে সেখানে স্থায়ী করা হয় না। হিপোক্যাম্পাসের কাজ হলো তথ্যটির চারপাশে থাকা নিউরনগুলোকে বারবার উদ্দীপিত করে কর্টেক্স বা মস্তিষ্কের উপরিভাগে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেওয়া। এই জৈবিক রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বলা হয় মেমোরি কনসোলিডেশন (Memory Consolidation)।

অধ্যায় ৭

পরীক্ষাভীতি দূরীকরণ ও স্ট্রেস ইনোকুলেশন থেরাপি

আগের অধ্যায়গুলোতে পরীক্ষার উদ্বেগ ও প্রস্তুতির অভ্যাস নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবার অনুশীলনের মাধ্যমে পরিচিতি বাড়ানো, ভুলের কারণ খোঁজা এবং পরীক্ষার পরিস্থিতি সামলানোর কয়েকটি উপায় দেখা যাক।

টিকা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কোনো জীবাণু বা তার উপাদান চিনতে শেখায়। সব টিকায় দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় জীবাণু থাকে না; টিকার প্রযুক্তি বিভিন্ন রকম। এখানে টিকার উপমাটি ব্যবহার করা হচ্ছে আগাম প্রস্তুতির গুরুত্ব বোঝাতে – মানসিক চাপ সামলানোর অনুশীলন ও টিকার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এক নয়।

মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক একই নিয়ম খাটে। একে বলা হয় স্ট্রেস ইনোকুলেশন ট্রেনিং (Stress Inoculation Training বা SIT)। কানাডিয়ান মনোবিজ্ঞানী ডোনাল্ড মাইকেনবাউম (Donald Meichenbaum) এই যুগান্তকারী থেরাপির উদ্ভাবন করেন।

আমাদের মস্তিষ্ক কোনো অজানা, অনিয়ন্ত্রিত এবং হঠাৎ উপস্থিত হওয়া পরিস্থিতিকে “জীবননাশী হুমকি” হিসেবে শনাক্ত করে। কিন্তু কোনো পরিস্থিতি যদি মস্তিষ্কের কাছে

আগেই চেনা থাকে, তবে অ্যামিগডালা আর অতি-সক্রিয় হয়ে রক্তে কর্টিসল ও অ্যাড্রেনালিনের বন্যা বইয়ে দেয় না। পরীক্ষার হলের ভয় আসলে কোনো প্রশ্নপত্রের ভয় নয়; এটি হলো একটি অপরিচিত পরিবেশ, সীমিত সময় এবং মূল্যায়নের ফলাফলের অনিশ্চয়তা থেকে তৈরি ভয়।

যখন কোনো শিক্ষার্থী ঘরের আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে বা গান শুনতে শুনতে কোনো চাপহীন পরিবেশে পড়ে, তখন তার মস্তিষ্ক শান্ত থাকে। কিন্তু পরীক্ষার হলে ঢোকার পর যখন ঘড়ির টিকটিক শব্দ, পরিদর্শকের নজরদারি এবং পাশে বসা সহপাঠীদের লেখার খসখস আওয়াজ যুক্ত হয়, তখন মস্তিষ্ক পরিবেশগত চরম অসামঞ্জস্যের (Environmental Mismatch) শিকার হয়।

পরিচিত ও নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনে পরীক্ষার পরিস্থিতির অস্বস্তি কমতে পারে। ধাপে ধাপে কাজের চাপ বাড়ানো, সময় ধরে প্রশ্ন সমাধান এবং পরে ভুল নিয়ে আলোচনা এতে সহায়ক। অস্বস্তি খুব বেশি হলে তা সহ্য করতেই হবে – এমন নয়। প্রয়োজন হলে শিক্ষক বা উপযুক্ত পেশাজীবীর সাহায্যে অনুশীলন সাজান।

মনোবিজ্ঞানের একটি মৌলিক নিয়ম হলো স্টেট-ডিপেন্ডেন্ট লার্নিং (State-Dependent Learning) বা অবস্থা-নির্ভর শিখন। এর সারকথা অত্যন্ত সরল কিন্তু গভীর: আপনি তথ্য শেখার সময় আপনার শরীর ও মনের যে রাসায়নিক ও

অধ্যায় ৯

মেটাকগনিশন ও চিন্তন প্রক্রিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা পরিবেশ, শরীর, হরমোন এবং মস্তিষ্কের তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের নানা দিক বিস্তারিতভাবে জেনেছি। কিন্তু একজন সাধারণ শিক্ষার্থী এবং একজন শীর্ষস্থানীয় কৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্যটি গড়ে দেয় একটি বিশেষ বৌদ্ধিক ক্ষমতা – যার নাম মেটাকগনিশন (Metacognition)।

মেটাকগনিশন শব্দটির সহজ অর্থ হলো "নিজের চিন্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন চিন্তা করা" (Thinking about thinking)।

অধিকাংশ শিক্ষার্থী যখন কোনো বিষয় পড়ে, তখন তারা পুরোপুরি বইয়ের তথ্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। তারা বুঝতে পারে না তাদের মস্তিষ্ক তথ্যটিকে কীভাবে গ্রহণ করছে, কোথায় তাদের বোঝাপড়ার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, কিংবা কোন কৌশলটি তাদের জন্য সত্যিই কাজ করছে আর কোনটি কেবল সময় নষ্ট করছে। তারা কাজ করে একটি স্বয়ংক্রিয় পাইলট মোডে (Autopilot Mode)।

মেটাকগনিশন হলো সেই পাইলট মোড থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে একজন তৃতীয় ব্যক্তি বা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা। এটি প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের সবচেয়ে উচ্চতর নির্বাহী ক্ষমতার প্রকাশ।

মেটাকগনিশনের স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী নিজেকে ক্রমাগত তিনটি মৌলিক প্রশ্ন করে: ১. “আমি এখন যা পড়ছি, তা কি আমি সত্যিই নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারছি, নাকি কেবল বইয়ের পরিচিত বাক্য দেখে মনে হচ্ছে যে আমি জানি?” ২. “এই সমস্যাটি সমাধান করতে গিয়ে আমি যে পদ্ধতি ব্যবহার করছি, সেটি কি সবচেয়ে কার্যকর, নাকি এর চেয়ে সহজ কোনো বৈজ্ঞানিক রাস্তা আছে?” ৩. “আমার মনোযোগ কি এখনো মূল ধারণার গভীরে আছে, নাকি আমার মন অজান্তেই খণ্ডিত হয়ে গেছে?”

যখন একজন শিক্ষার্থী নিজের চিন্তার ওপর এই নজরদারি চালাতে শেখে, তখন সে পড়ার টেবিলে নিজের শিক্ষক নিজেই হয়ে ওঠে। ফলে সময় বাঁচে বহুগুণ এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি কমানো যায়।

ডানিং-ক্রুগার প্রভাব (Dunning-Kruger Effect) নিয়ে গবেষণায় দেখা হয়েছে, সীমিত দক্ষতা থাকলে মানুষ কীভাবে নিজের কাজের মান অতিরিক্ত ভালো বলে বিচার করতে পারে। এই প্রবণতা প্রত্যেক কম দক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে একই নয়। নিজের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য কাজ করে দেখা এবং প্রতিক্রিয়া নেওয়া প্রয়োজন।

অধ্যায় ১০

পরীক্ষার দিনের নিউরো-ব্লুপ্রিন্ট ও চূড়ান্ত কার্যকারিতা

একটি দীর্ঘ শিক্ষাবর্ষের শ্রম, ১০০ ঘণ্টার অধ্যবসায় এবং পূর্ববর্তী নয়টি অধ্যায়ে আলোচিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলোর চূড়ান্ত পরীক্ষা ঘটে একটি মাত্র দিনে – পরীক্ষার দিনে। অনেক শিক্ষার্থী সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করেও কেবল পরীক্ষার আগের দিন ও পরীক্ষার সকালের মারাত্মক কিছু শারীরবৃত্তীয় ভুলের কারণে আশানুরূপ ফলাফল করতে পারে না। স্নায়ুবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে, পরীক্ষার দিনটি কোনো নতুন জ্ঞান অর্জনের দিন নয়; এটি অর্জিত জ্ঞানকে কোনো বাধা ছাড়া খাতার পাতায় রূপান্তর করার একটি নিখুঁত নিউরো-বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়া।

এই প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে পরীক্ষার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে।

পরীক্ষার আগে রাত জেগে পুরো পাঠ্যক্রম নতুন করে পড়ার চেষ্টা চাপ বাড়াতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখে নিয়ে ঘুমের সময় রাখুন। ঘুম শেখা তথ্যের সংহতি ও পরদিন কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আগের দিন কাজের চাপ কিছুটা কমিয়ে পরিচিত অংশের রিভিশনে বেশি সময় দিন। অপ্রস্তুত অংশ থাকলে কতটা শেখা সম্ভব তা বাস্তবভাবে বিচার করুন। নতুন কঠিন বিষয় শেষ করতে গিয়ে ঘুম ও বিশ্রামের সময় যেন পুরো নষ্ট না হয়।

আগের সন্ধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, সংক্ষিপ্ত নোট, চিত্র ও ছক দেখে নিন। নতুন করে পুরো বই শেষ করার চাপ না নিয়ে ঘুমের আগে পড়া গুটিয়ে রাখুন। নিজের বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত ঘুমের সুযোগ রাখুন। কখন বই বন্ধ করবেন তা পরীক্ষার সময়, যাতায়াত ও স্বাভাবিক ঘুমের রুটিন অনুযায়ী ঠিক করুন; সবার জন্য রাত দশটার একই সীমা নয়।

ঘুম ভাঙার মুহূর্ত থেকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করার সময়টুকু শিক্ষার্থীর স্নায়ুতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই কয়েক ঘণ্টার প্রতিটি আচরণ নির্ধারণ করে পরীক্ষার টেবিলে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স শান্ত থাকবে নাকি অ্যামিগডালা প্যানিক সার্কিট চালু করে দেবে।

ভোরের আলো ও রেটিনা: ঘুম থেকে উঠে অপ্রয়োজনীয় ভিডিও বা বার্তায় সময় না দিয়ে সকালের প্রস্তুতি শুরু করুন। স্বাভাবিক আলোয় কিছু সময় থাকা ঘুম ও জাগরণের ছন্দে সাহায্য করতে পারে। সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাবেন না। পরীক্ষার দিন নতুন কোনো কঠিন রুটিন শুরু করার বদলে পরিচিত অভ্যাস বজায় রাখুন।

পরীক্ষার সকালের খাবার: পরিচিত, সুষম ও সহজপাচ্য খাবার খাওয়ার সুযোগ রাখুন।